সিগমুন্ড ফ্রয়েড

[১৮৫৬–১৯৩৯]

ফ্রয়েডের জন্ম ৬ই মে ১৮৫৬ সালে অস্ট্রিয়ার মোরাভিয়া প্রদেশের ফ্রেইবার্গ শহরে। তাঁর বাবা জ্যাকব ফ্রয়েড ছিলেন পশম ব্যবসায়ী। সিগমুন্ডের মা এ্যামিলা ছিলেন জ্যাকবের দ্বিতীয় স্ত্রী। দু'জনের বয়েসের ব্যবধান ছিল কুড়ি বছর।

জ্যাকবের প্রথম পক্ষের চারটি সন্তান। সিগমুন্ড তাঁর মায়ের প্রথম সন্তান। তাঁর পরে এ্যামিলার আরো ছটি সন্তান জন্ম নেয়।

সেই সময় দেশে শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে বয়ন শিল্পে সংকট দেখা দিয়েছে। জ্যাকব ক্রমশই বুঝতে পারছিলেন মিলে তৈরি কাপড়ের সাথে তাঁর পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব নয়। জ্যাকব ফ্রেইবার্গ ছেড়ে পাকাপাকিভাবে ভিয়েনাতে এসে বাসা বাঁধলেন এখানে এসে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করলেন তিনি। এই ভিয়েনা শহরেই কেটেছে সিগমুন্ডের বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব।

আট বছর বয়স পর্যন্ত সিগমুন্ডের বাবাই ছিলেন তাঁর শিক্ষক। যখন তাঁর আট বছর বয়েস, ভিয়েনার স্পার্ল স্কুলে ভর্তি হলেন। প্রথম বছরের পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম হলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা অবধি তিনি কোনদিন দ্বিতীয় হননি। নানান বিষয়ে ছিল তাঁর আগ্রহ–সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান। চোদ্দ বছর বয়সে দার্শনিক জন স্টুয়ার্ড মিলের রচনাবলীর বেশ কিছু অংশ জার্মান ভাষা থেকে অনুবাদ করেন। কিন্তু পারিবারিক আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে স্কুলের পাঠ শেষ হবার আগেই মনস্থির করলেন ডাক্তারি পড়বেন।

ছেলের এই উচ্চাশা দেখে নিজের প্রতিকূল আর্থিক অবস্থা সত্ত্বেও সিগমুন্ডকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে দিলেন জ্যাকব। ১৭ বছর বয়সে ভিয়েনা মেডিকেল কলেজের ছাত্র হলেন সিগমুন্ড।

প্রথম দু বছর চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোন শাখা নিয়ে পড়াশুনা করবেন মনস্থির করতে পারেননি সিগমুন্ড। এই সময় সিগমুন্ডের সৎ ভাই ছিলেন ইংল্যাণ্ডে। জ্যাকব তাঁকে ইংল্যাণ্ড ভ্রমণের জন্য পাঠালেন।

১৮৭৬ সালে ফিরে এলেন ভিয়েনাতে।

সেই সময় মেডিকেল শরীরতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন ব্রুকে। শিক্ষক হিসাবে ব্রুকে ছিলেন খুবই খ্যাতিমান। ব্রুকের শিক্ষক রবার্ট মেয়র ছিলেন ভিয়েনার সর্বশ্রেষ্ঠ শরীরতত্ত্ববিদ। তাঁর কিছু মৌলিক আবিষ্কার চিকিৎসা বিজ্ঞানের জগতে সাড়া জাগিয়েছিল। সিগমুন্ডেরও ইচ্ছা ছিল শুধুমাত্র একজন চিকিৎসক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা নয়, রবার্ট মেয়রের মত নতুন কিছু উদ্ভাবন করা।

অল্পদিনের মধ্যেই তিনি হয়ে উঠলেন ব্রুকের সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র। তাঁর গবেষণাগারেই কাটত দিনের বেশিরভাগ সময়। শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে এতখানি মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন, চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্য বিষয়ের প্রতি তেমন সময় দিতে পারতেন না। সেই কারণে অন্য সব ছাত্ররা পাঁচ বছরে যে পাঠ্যসূচি শেষ করত, সিগমুন্ডের সেখানে সময় লাগল আট বছর। এই সময়ের মধ্যেই তিনি স্নায়ুতন্ত্রের উপর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধগুলির মৌলিকতা লক্ষ্য করে শিক্ষকদের সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন।

১৮৮১ সালে পঁচিশ বছর বয়সে কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডক্টর অব মেডিসিন উপাধি পেলেন। তাঁর উত্তরপত্র দেখে শিক্ষকরা তাঁকে কলেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্র হিসাবে ঘোষণা করেন।

ছাত্র অবস্থাতেই সিগমুন্ড তাঁর বোনের ননদ মার্থা বার্নেসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। পাশ করবার পর তিনি বুঝতে পারলেন অর্থ উপার্জন করতে না পারলে মার্থাকে বিবাহ করা সম্ভবপর নয়। তাই ব্রুকের গবেষণাগার ত্যাগ করে ভিয়েনা জেনারেল হাসপাতালে ইনটার্ন হিসাবে যোগ দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তার পদে উন্নীত হলেন।

ভিয়েনা হাসপাতালে ছিলেন বিখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ থিওডর মেরারেত। তাঁর অধীনে ফ্রয়েড মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের উপর গবেষণা আরম্ভ করলেন।

তিনি ভিয়েনার হাসপাতালে স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে চাকরি নিলেন। কয়েক মাস চাকরি করবার পর তিনি একটা স্কলারশিপ পেয়ে প্যারিসে রওনা হলেন।

কিছুদিন শার্কোর অধীনে কাজ করার পর ভিয়েনাতে ফিরে এলেন। মার্থাকে ছেড়ে থাকতে তাঁর সমস্ত মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ভিয়েনাতে আসবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মার্থাকে বিবাহ করলেন ফ্রয়েড।

অল্পদিনের মধ্যেই চিকিৎসক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর কাছে রোগীর ভিড় লেগেই থাকত। প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে আরম্ভ করলেন ফ্রয়েড

এইবার ভিয়েনার চিকিৎসক সমাজের পক্ষ থেকে প্রবল বাধার সৃষ্টি হল। প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েও সামান্যতম বিচলিত হলেন না ফ্রয়েড। তিনি সমস্ত সংস্থা থেকে পদত্যাগ করে পুরোপুরিভাবে নিজের চিকিৎসা ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করলেন। এরই সাথে সাথে তাঁর গবেষণার কাজ চালিয়ে যান।

দীর্ঘ দশ বছর ধরে চলল তাঁর অক্লান্ত গবেষণা। এই সময় ব্রুকের নামে একজন চিকিৎসক এগিয়ে এলেন ফ্রয়েডের সাহায্যে। ইতিপূর্বে ব্রুকের বেশ কিছু রুগীকে সুস্থ করে তুলেছিলেন। দুজনের সম্মিলিত গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত হল "Studies in Hysteria" নামে একখানি বই।

এই বইখানি মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা জগতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল। এতেই তিনি প্রথম প্রকাশ করলেন অবচেতন মনই স্নায়ু সংক্রান্ত সমস্ত রোগের মূল কারণ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি এক নতুন ধারণার উদ্ভাবন করলেন, যার নাম দেওয়া হল মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis)।

ফ্রয়েড বললেন, মানুষের মনের মধ্যে রয়েছে চেতন আর অবচেতন মন। মানুষের শৈশব থেকেই তার মধ্যেকার অহংবোধ বা ইগো কোন কারণে অবদমনের ফলে বহু যৌনকামনা চেতন মন ছেড়ে অবচেতন মনের স্তরে ডুব দেয়। তার থেকেই দেখা দেয় মনোবিকার। ফ্রয়েডের মতবাদের মূলকথা ইডিপাস কমপ্লেক্স। তিনি বলেছেন শিশুর মধ্যে থাকে যৌনবোধ। এই যৌনবোধই অসুখের মূল কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন।

তিনি আরো বললেন, মানুষ ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে, যদিও ঘুম ভাঙলেই ভুলে যায় সেই স্বপ্নের কথা। কিন্তু স্বপ্ন তার মনের চিন্তা-ভাবনার প্রতীক। প্রতিটি মানুষের মনের মধ্যেই থাকে বিভিন্ন ইচ্ছা, থাকে কামনা-বাসনা। নানান কারণে সেই কামনা-বাসনা পূর্ণ হয় না। আর এই অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রভাব পড়ে মানুষের স্নায়ুর উপর যার ফলশ্রুতিতে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে।

নিজের মতবাদকে আরো জোরালোভাবে যুগান্তকারী গ্রন্থ Interpretation of Dream। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গিয়েছে মাঝে মাঝে এমন এক একটি বই প্রকাশিত হয়েছে যা মানুষের চিন্তা-ভাবনার জগৎকে ওলটপালট করে দিয়েছে। তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়েছে মানুষের যুগ যুগান্তরের ধ্যান-ধারণা।

এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন ইনটারপ্রিটিশন অব ড্রিমস (Interpretation of Dreams)। এই বইটিতে প্রকাশ পেয়েছে স্বপ্ন সম্বন্ধে তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা, বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণের সূত্রেই তিনি বলেছেন মানুষের মনের অবদমিত ও অপরিতৃপ্ত যৌন কামনার কথা।

এতদিন এই স্বপ্ন সম্বন্ধে চিকিৎকদের কোন ধারণাই ছিল না। স্বপ্ন তাদের কাছে ছিল অস্তিত্বহীন এক কল্পনা। ফ্রয়েডই যে শুধু তাঁর উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন তাই নয়, তিনিই প্রথম মনোরোগের ক্ষেত্রে স্বপ্নের ব্যবহারের সুচিন্তিত পথ দেখালেন।

ফ্রয়েডের খ্যাতি ভিয়েনা ছাড়িয়ে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর বিতর্কিত মতবাদ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা আলোচনা শুরু করলেন। নিজের মতবাদকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ফ্রয়েড লিখে চললেন একের পর এক বই-"The Psychopathology of everday life (1904), Wit and its Relation to the Unconscious (1905), The three Contributions to the theory of sexuality (1905), Totem and tabu (1913)"। এই সমস্ত বইগুলির মধ্যে ঘটেছে তাঁর চিন্তা-ভাবনা মনীষীর পূর্ণ প্রকাশ।

১৯০৯ সালে আমেরিকার ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনঃসমীক্ষণ বিষয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ আসে। আমেরিকাই প্রথম দেশ যারা ধর্মীয় ও মানসিক গোঁড়ামি ত্যাগ করে ফ্রয়েডের মতবাদের সার্থকতা, গভীরতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল।

ধীরে ধীরে ফ্রয়েডের মতবাদ বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতরা গ্রহণ করতে থাকেন। ধীরে ধীরে জার্মান ফরাসী চেক ইংরেজদের মধ্যে মুক্ত মনের গবেষকরা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করে ফ্রয়েডের চিন্তা-ভাবনা।

১৯৩০ সালে তাঁকে গ্যোটে পুরস্কার দেওয়া হয়। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্রমশই উপলব্ধি করতে পারছিল ফ্রয়েডকে অস্বীকার করার অর্থ প্রকৃত জ্ঞান থেকে নিজেদের বঞ্চিত করা। তাই ১৯৩২ সালে তাঁকে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ুরোগ বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করা হল। ১৯৩৬ সালে ব্রিটেনের রয়াল সোসাইটি তাঁকে বিদেশী সদস্য হিসাবে নির্বাচিত করল।

১৯৩৩ সালে তাঁর উপর নেমে এল অপ্রত্যাশিত এক বিরাট আঘাত। জার্মানীতে তখন প্রভুত্ব করছেন হিটলার। ইহুদীদের প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণা আর বিদ্বেষ। ফ্রয়েড ছিলেন ইহুদী। হিটলারের অনুগত বাহিনীর মনে হল ফ্রয়েডের রচনা খ্রিষ্টান ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁর রচনা সম্বন্ধে বলা হয় "ইহুদী অশ্লীলতার চরম প্রকাশ"।

নিষিদ্ধ করা হল তাঁর সমস্ত রচনাবলী। নাৎসী অধিকৃত এলাকায় যেখানে তাঁর যত বই পাওয়া গেল সব দখল করে নেওয়া হল। তাঁর অনুগামীদের যে সব গবেষণাগার ছিল ছিল সব ভেঙে চুরমার করে ফেলা হল।

১৯৩৭ সালে জার্মান বাহিনী অষ্ট্রিয়া আক্রমণ করল। হিটলারের ইহুদী বিদ্বেষ তখন প্রবল আকার ধারণ করেছে। ফ্রয়েডের বন্ধুবান্ধব, তাঁর অনুগামীরা তখন তাঁকে অষ্ট্রিয়া ত্যাগ করবার জন্য বারংবার অনুরোধ করতে থাকে।

ফ্রয়েড বিরাশি বছরে পা দিয়েছেন। যে শহরে তিনি কাটিয়েছেন তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব বার্ধক্য, সেই ভিয়েনা ত্যাগ করে যেতে মন চাইছিল না।

হিটলারের নাৎসী অষ্ট্রিয়া দখল করল। বৃদ্ধ ফ্রয়েডকে গৃহবন্দী করা হল।

তাঁকে অষ্ট্রিয়ার বাইরে নিয়ে আসার জন্য জোর প্রচেষ্টা শুরু হল। নাৎসী নায়কদের কাছে বারংবার অনুরোধ জানানো হল তাঁকে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য। তাঁর মুক্তিপণ হিসাবে নাৎসী সরকার কুড়ি হাজার পাউন্ড অর্থ দাবী করল। দেশে দেশে আবেদন করা হল। ফ্রয়েডের সাহায্যে এগিয়ে এলেন গ্রীসের রাজকুমারী। তিনি এই অর্থ প্রদান করলেন। ফ্রয়েডকে নিয়ে যাওয়া হল ইংল্যান্ডে।

বৃদ্ধ অসুস্থ এই জ্ঞানতাপসকে সাদরে বরণ করে নিল ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা। তাঁকে রয়াল সোসাইটির ফেলো হিসাবে নির্বাচিত করা হল। ইংল্যান্ডের সেরা চিকিৎসকরা তাঁর চিকিৎসা আরম্ভ করলেন।

কিন্তু পরবাসে এসে মনের সব শক্তিটুকু হারিয়ে ফেললেন ফ্রয়েড : তাঁর দেহ ক্রমশই ভেঙে পড়ছিল। ইংলন্ডে আসবার পনেরো মাস পরে ১৯৩৯ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর লন্ডন শহরে মাহপ্রয়াণ ঘটল এই মহাজ্ঞানীর। তার কয়েকদিন আগে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

ফ্রয়েড-উদ্ভাসিত তত্ত্বের বাস্তব পরিমার্জনা করে তাকে ব্যাপকভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাজে প্রথম প্রয়োগ করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোবিজ্ঞানীরা। ফ্রয়েড মানুষের সকল কর্মের নিয়ামক হিসাবে যৌনতাবোধের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তাকে উত্তরকালের বিজ্ঞানীরা পুরোপুরিভাবে স্বীকার করতে পারেননি।

মানব মনের জটিলতাকে পুরোপুরি উন্মোচন করতে না পারলেও তিনিই যে এই পথের অগ্রনায়ক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর প্রদর্শিত পথ ধরেই মানুষ একদিন হয়ত জটিল জীবন সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবে।

Sigmund Freud, www.banglainternet.com